মারাসিম

রমিত দে

মারাসিম

রমিত দে

পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯
e-mail : kabisammelan_patralekha@yahoo.co.in

MARASIM
A collection of Bengali Poems
by Ramit Dey
Price - Rs 65.00

গ্রন্থস্বত্ব : সাধনা দে

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১১
প্রকাশক : গুণেন শীল, পত্রলেখা, ১০ বি কলেজ রো কলকাতা -৯
মো: ৯৮৩১১১০৯৬৩
মুদ্রক : শেঠ ইনফরমেটিক্স কলকাতা - ৩৫
বর্ণসংস্থাপন : ভাষাশিল্প কলকাতা -৩৬
প্রচ্ছদ : চঞ্চল গুঁই
দাম : ৬৫.০০
সামগ্রিক সহযোগিতায়
'সময়ের শব্দ'
e-mail : somoyershobdopotrika@gmail.com
blog : somoyershobdopatrika.blogspot.com
Ph : 9830999651

আমার মা-কে

Why, I ask, does the earth not shrink to a point?
Why at first, did this wide sky lure the heart?
All around are strange people, strange words :
Some slide over the heart, others pierce it.
On these waving words flows the heart's vessel,
Which finds no shore.

Whomever I meet I duly greet, smiling,
but what lips affirm
In " I know you," the heart denies with " I don't"
I move on those waves
And find no shore.

... M.A.R. Habib

সারাদিন কেটে গেল
স্নান করতে এসে দেখি আমার গিটারের তার ছেঁড়া,
এখন, পাঁচতলা বাড়িটার নিচে দাঁড়িয়ে
ফুলিয়ে নিচ্ছি ফুসফুসের লেস
তিনটে সাদা আর একটা কালো মৌটুসী পাখিকে
বলছি হ্যালো
হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো?

অনেকটা দূর থেকে কথা হয়েছিল আমাদের।
অনেকটা দূর— এই ধরো, যেখান থেকে
একটা ব্যাঙ অর্ধেক জলে পা ধুতে ধুতে
ধুতে ধুতে বৃষ্টি হয়ে গেল।
আমি ঠিকানা দিইনি জলবন্দী গেরস্তের,
এখন দশমাস, ফুসফুসের ভেতর সব পা হারানো দিন
এখন দশমাস অনেক দূর থেকে কথা হবে আমাদের।

যারা খুঁজতে বেরোলো দুটো চোখ
শেকড়ে-হাওয়ায়-কেটে যাওয়া ঘুড়ির কোরাসে
তারা জানতে চেয়েছিল
রোজ রোজ খিল খুলে কান্না কোথায় যায়!
ক্রমশ হাট ভাঙে— পাড়ের বুড়ো গাছ ভাঙে
আর, দেড় আঙুলের এক একটা হাওয়া, বুক পকেটে
নামিয়ে রাখে রাত্রিযাপনের কুলীন অভ্যেস।

কেন প্রশ্ন করি পৃথিবীর বয়স?
গোঁফদাড়ি ছাড়া কমবয়েসী পাখিদের মতো
ডানার ভেতর নড়ে ওঠে নদীর বোতাম;
নদী হয়ত পায়ের নিচে, কিম্বা
কাল সারারাত সবকটা পাড় ভেঙে গেছে জন্মানোর আগেই
দূরে, টুপি নাচিয়ে নাচিয়ে লক্ষ্য রাখছি
ঘোলা জলের সবকটা দরজা...

কখনও চেয়েছিলে জলের ভেতর
নেমে আসা গাছেদের পা?
জলেতে দাঁড়িয়ে সেই মনে পড়ে,
কাউকে বলিনি, শুধু জল হয়ে গেছে গাছেদের পা।
এসো, মেঘ করে এলে নেমে এসো
নীলপাখিটার কাছে টিপসই রেখে
একা হতে হতে নেমে এসো...

কিছু আলো দাও— অনিশ্চিত আলো।
আমার চৌকো চৌকো কান্নাকাটি,
পেরোতে গিয়ে ফেলে এসেছে পিদিমের পালক।
এখন, হলুদ টিলার ওপর বৃষ্টি খুলেছে যে পাগল
তার কোন কষ্ট নেই—
ধোঁয়ার মত গিলে ফেলতে পারে
ঘুমে হেলান দেওয়া ঝিঁ ঝিঁদের।
শুধু কিছু আলো দাও— বয়ঃসন্ধির শুভ্রতায় মিশিয়ে
দাও হাইওয়ের যন্ত্রণা।

জলের সমস্তটুকুই বোধহয়
এভাবেই লড়াই করতে থাকে ,
সে কি পূণ্যের লোভ?
নাকি সমর্পণের মতো
নির্জলা মাছেরাও হলুদ জলের রুমমেট হয়ে যায়!
যা আছে— ফুটে আছে— কোমর নদীর ওপরে,
সে জানে না, মাস তিনেক আগেই
তার ডান চোখ বেরিয়ে পড়েছে বাঁ চোখের দিকে

আমার পুরুষ গন্ধ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে
তোমার প্রসন্ন হাসি।
জিভের কোয়ার সাতনরি বর্ষাকাল।
প্রত্নমেঘের মতো ঠোঁটের ফাঁকে যেটুকু জবুথবু পাখি,
ভাবি, চুরি করে নেব নির্জনের উৎসবে,
পুরুষাকারে তুলে নেব তোমার স্তব।
... কবে থেকে অন্ধ এমন আমি!
... কবে থেকে?

বুঝিয়ে সুঝিয়ে এসেছি শেষরাতের পাখিকে।
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। চৌপাইয়ে শুয়ে আছে
মেটে হলুদ দেওয়ালগুলো।
এখন শুধু ছুটির অনুমতি;
শীত শুরুর আগেই, চুরি যাওয়া হেমন্তের কাছে
দুমাসের ছুটি নিতে হবে
আমার একতলা-দোতলা অভিমানে
এই প্রথম ঝুলবে আমার পাখি হওয়া।

ফিরে যাচ্ছে তুমুল নদী
ফিরে যাচ্ছে কেমন সব শূন্য,
আজ ফিরে যাওয়ারা বড় রোগা;
শেষ পর্যন্ত হেঁটে গেলে... দেখা হতো ভোরের সাথে
অথচ, ঘুমোবার অছিলায় ঝিমিয়ে নিল গোটা গ্রাম।
আমার তিরিশ বছর, ঝিল পেরোতেই
বারিষ এলো অনন্ত বীজের সহবাসে।

চেতনা মানে হেরে যাওয়া।
এই ধরো, যে রাগী যুবক
একদিন স্বপ্ন খেয়ে ফেলে
আকার-ইকার ছড়িয়ে ফুল হয়ে গেছিল,
তুমি ভাবো— সে এখন কোথায়?
দেখো, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা মাথা
তার যাবতীয় রুমানি লিরিকের সাথে কবি হয়ে উঠছে।

ততদূর হলুদ হয়ে আসা অসুখ
যতদূর ধরা যায় না।
শুধু সম্পর্কের মত কিছু সমান্তরাল,
বৃষ্টিকে পেরিয়ে গেলেই
মেঘ হয়ে কড়া নাড়ে।
কেউ নেই, তবু, কোন অদৃশ্য হাত
ডোরবেলে রেখে যায়—শ্রাবণের ঠিকানা!

ফিরে যাওয়ার শব্দগুলো
চুরি করে রেখে আসি ফোটার আগেই।
ভাবি, এই বেশ ভালো, আলো জ্বেলে
শাড়ি পরিয়ে দেব ডাগর বিষণ্ণতাকে;
শুধু, থাকা এবং না-থাকা-
বাকিটুকু ফিরে গেছে জলের দিকে
ঘাসে-জলে থেমে যাওয়া বাসি গন্ধের দিকে।

একটা মেঘ খুলে ফেললেই
নদীর পেটে লাফিয়ে নামে মুখের মতো কিছু।
মুখ কুড়িয়ে নিই, কিম্বা
মুখের মতো কিছু...
তারপর, নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকি
পথের দুপাশে আবছা হয়ে আসা
যাই যাই নীরবতায়।

গবেষণা করি আমার শর্তহীন হেঁটে যাওয়া।
আধখানা আলোর লোমে যারা আজও দাঁড়িয়ে,
আলো জ্বালতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল যেন
ওই গাছে— ওই ঘাসে— ওই নীরব ক্রান্তিকালে।
মনে পড়ে না— একটাও শব্দ লিখেছিলাম কিনা।
এই সরু রাস্তা— এই মরচে ধরা আলো— এই বহুদূরের তুচ্ছ নীরবতা
ফিরে যেতে যেতে, শেষ কবে বলেছিলাম,
স্থায়ী হোক— স্থায়ী হোক!

স্থায়ী হোক— স্থায়ী হোক কৃষ্ণপক্ষের কাক
স্থায়ী হোক— স্থায়ী হোক ধুলো শহর
স্থায়ী হোক— স্থায়ী হোক কুলিকের পোয়াতি অভিমান
মনে পড়ে না—
রাতের ভেতর কারা এসে দাঁড়ায়
কারা ডাকে এতদূর থেকে!
পেরিয়ে যাই অস্ফুট রোদের মতো আরও এক পশলা।

ধুলোবাড়ি ঘুমিয়ে আছে,
আর প্রত্নঘোরের মত,
আলো পুঁতে যাচ্ছো বধির বাতিঘরে।
আলো বেজে ওঠে।
আলো চলে যায় প্রথম হাওয়ার অভিমানে।
কীভাবে ফিরবে প্রসন্ন তারার দিকে?
এ ঘোর যে তোমায় পেয়েছে কাকভোরেই।

বৃষ্টি শেষ, —এখন আর বড় হবে না মেঘ।
ধুতরোর ঝোপ থেকে, কমবয়েসী রোদ
পাশ ফিরে দেখে নেবে অনেকখানি মনখারাপ;
এরপর, মনের নাম হবে আনমনা
আর আমি নির্বাক চরাচরে উড়িয়ে দেব পাতা।
সব ভুলভাল পাতা— ধোঁয়ানো গন্ধ মাখানো—
চড়ুইয়ের ঘুম মাখানো;
দুরু দুরু তেরচা পাতা...

ওই গাছটা পর্যন্ত আমার বেড়ে ওঠা,
তারপর, আমি একটা ঘটনা
একটা মুখচোরা নির্যাস।
এই সন্ধ্যায় ওরা কারা?
স্নানে বেজে যাওয়া মেলানকলি!
আজ সব সত্যি বলো... দেখো, ঠিক ঠিক
জানলা নিভিয়ে আমি বেজে যাব
অরণ্যের আবদারে।

টুকরো টুকরো দূরত্বদের নিয়ে
এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের কবিতা লিখি,
বিশ বছরের নুলো হাওয়া মেঘদূতের মতো
গড়গড়িয়ে ঢুকে পড়ে শরীরের আঁচে,
শরীর এখন জমি— উঁচু জমি
বীজের হাইফেনে কারা যেন পুঁতে গেছে চাঁদের ঘুম
চোখ খুলে রাখা খাল পেরোতেই,
মাঝে মাঝে ভাবি,
কটা বাজে?

ধুলোবালি মেখে একটা গাছের মতো পড়ে আছি।
যেমন করে গাছেরা পড়ে থাকে
সব ধুয়ে কিম্বা সব মেখে
আমি বাড়ছি— আমার দেওয়াল দালান
সব কিছুর গায়ে সেঁটে দিচ্ছি বন্ধুহীন বেড়ে ওঠা,
জানো, যেভাবে গাছেরা বেড়ে ওঠে বোবা সিল্যুয়েটে,
আজকাল ঘোর লেগে যায়—
গাছেরা আমায় ছুঁলে

আমার মাথার ভেতর বড় বড় হরিতকী গাছ
নম্বরহীন।
নেমপ্লেটে বসিয়ে নিচ্ছে আসা এবং যাওয়া
ওরা কেমন করে কথা বলে?
শরীরটাকে কেমন করে ভিক্ষা চায়?
আর আমি থ মেরে যাই— কেমন করে!
দেখো, দেখো, একটা বিকেল কেমন হলুদ হয়ে যাচ্ছে
মৃত্যুঞ্জয়ের ভেতর...

কার হাত ধরে লাফিয়ে নামলে তুমি?
হাত কি কারও ছিল? হিংসে হল!
নাকি, গত বর্ষার মত দীর্ঘ হল ফুলফোটানোর খেলা?
আসলে হাত বলে কিছু নেই
এসব সময় বিস্তারটুকুই কেঁপে ওঠে রোগা যুবকটির গল্পের মতো
যে কিনা ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে তোমার মাথা থেকে পা
পা থেকে ছায়া....

কিছুদিন হলো বুকপকেটে লুকিয়ে রাখছি হেমন্ত
অদ্ভুত বদলে যাচ্ছি যেন
সন্দেহের মতো অতিক্রম করি ভেতরের শিরীষ গাছটাকে
তারপর, একটা বড় হাঁ যেন পেয়ে যায় আমায়।
দু পোঁচের লোকটাকে নিয়ে চলে অজ্ঞাতবাসের দিকে।
নিষিদ্ধ কাকের কাছে আত্মহত্যার গল্প রেখে
আমিও কি ফিরে যাচ্ছি মাদী মৃত্যুর দিকে?

কিছুই মনে পড়ে না
ঝড়-বৃষ্টি-রোদ খড়কুটোর উপোসি মুখগুলো
এখনও ভূমিকাহীন।
এই যে দেড়খানা পাতার ভেতর লুকিয়ে রাখা চরাচর,
আর বুঝি কোথাও যাওয়ার নেই
শুধু খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়া
হারিয়ে যাওয়ার গল্পে।

ডাকনামে ডেকে নিলে স্তব্ধতা আসলে
কম বয়েসী একটা মেয়ে;
মুখ ধুচ্ছিল যে ছায়ায়
উদাসীনতার প্রস্তাব দিল সে ছায়াকেই।
না, কোনদিনও সে বলেনি অসুখে পেয়েছে
শুধু সুখের হাতে চুড়ি পড়িয়ে
ফিরে গেছে অ্যাসাইলামের দিকে।

যে বেরিয়ে পড়েছে পথে তাকে কি নীরবতা বলে?
তবে, মাড়িয়ে মাড়িয়ে যে এল
কেন তার কাছে বোকা হই?
অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম চোখ থেকে নাক পর্যন্ত
ধানকাঠা শরীরের কোলনে।
এখন একা হব—
সন্ধের চা নিয়ে হৃদপিন্ডের অলিতে
সহজেই শনাক্ত করে নেব... সুমেরুর রাতচরা পাখি।

আমার মৃতদেহ ফিরিয়ে আনছে ওরা।
সব হলুদ সব নষ্ট জন্মের দিকে মুখ ফিরিয়ে
অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছে, তওফিক থেকে
ঝরে যাওয়া পাখিটাকে।
আমি চাই রোদ মাখিয়ে নিজেকে হত্যা করতে।
সূর্যাস্তের পর, তবু কেন বেঁচে ওঠে বাঁচা! —
বেঁচে ওঠে বিস্মৃতি!
এপিটাফের গালে একা একা বেড়ে ওঠে
পোড়া ধূপের চুমু!

মাথাটা ফুটো হতেই পায়চারী করতে লাগল
অবশিষ্ট রাতের কুটো;
টুকরো টুকরো বিন্যাস
লাফিয়ে নামল উদ্বৃত্ত কুড়িয়ে,
আর আমি অসহায়ভাবে বসে পড়লাম
নৌকা বাওয়ার ভেতর।
জল ঠেলে ঠেলে হরিণীরা নিভিয়ে দিলে সাগরিক মোমবাতি
জোলো হাওয়ার ভেতর হেসে উঠলো জলের অভিমান।

বিশ্বাস করবে বলে যারা এসেছিল
হাত তুলে চলে গেছে কৃষ্ণচূড়ার রোলকলে।
আর কে কে আছো, যারা বিশ্বাস করবে
আমি রোদ মেখেছি
বিশ্বাস করবে অকারণে
বেড়ে উঠেছি।
আমি কি জীবিত? তবে, গর্ভমৃত বিশ্বাসের কাছে জন্ম
নিই কেন!
কত দূরে আছো জন্মানোর ফেনা?
আমি যে ভুলতে চাই অপরাহ্নের ফেরা...

দেবতার কানে কানে
জন্মশোধের কথা বলি।
সনাক্ত করতে পারি না আত্মমৈথুনের হরিণদের,
শুধু জানি তারা আমায় উচ্চারণ দিয়েছে।
ছুঁয়েছে, ছেড়ে চলে গেছে বৃত্তের মতো শরমী চাঁদের দিকে।
তবে, ঈশ্বর কোথায় ছিলে তুমি?
বুকের হেনায় দখল নিচ্ছে শহীদ বাতিঘর—
ঈশ্বর— ঈশ্বর...

এরপর ধানমাঠ
এরপর খিলি সাজিয়ে কামরাঙা রোদ
নেমে গেল বিলাবল নদীর রিডে।
আসলে তুমুল এক ঘোর,
লংশটে ঘুম ভেঙে ঘোর ভেঙে পা ছড়িয়ে বসে
তিরিশ চল্লিশের এক মদেশিয়া হাওয়া।
বুঝে নিতে চায় তার পরের দৃশ্য...

আবার বৃষ্টি এলো।
বাতাসের হাওয়া কিম্বা জ্বলভরি হাওয়ার বাতাস
তুমিও নামিয়ে দিলে গোড়ালি অব্দি ঢেউ।
এখনি কি সমুদ্র বুনে দেবে রাত!
আমি নুন নিয়ে দাঁড়িয়ে তরুণ দ্বিধার মতো
মৃত সব বিকেলের মুখ— মৃত সব শ্রাবণের পাখি
ঝাউয়ের শাসনে নিঃস্ব হল যে- সেই কি তুমি!

আর কত দূরে! কত দূরে!
কবিতা পেরিয়ে ছুঁয়ে দেব মানুষের মত কিছু আলাপ।
তেষ্টা পাচ্ছে আমার— এবারেই হয়ত ইউক্যালিপটাসের
রোদ ধরে

বলে উঠব এখানে মানুষ নেই
স্রেফ ঘুরে ঘুরে সিনবোনে প্রতিশ্রুতি রেখে
লিখে যাব ঘুমছেঁড়া ফুটো নৌকার কথা।
ও কার জামা! ও কার ক্ষোভ ঝুলছে অলীক মাস্তুলে!

এক একটা দিন লাফ দিয়ে দেখি ঠিক কতটা বেড়েছি।
কতটা বাড়লে আর ঝুলতে হবে না
অন্ধ লোকটার কাঁধে হাত রেখে।
গোঁফ না ওঠা হাওয়া তুলে নিলে কমলালেবুর শব
এক একটা দিন ছুঁয়ে থাকি কোঁচকানো আগুনে।
শোক পেরোলেই দিকভুল— যা কখনো মেলে না তাই গণিত;
হাওয়া ফেলে পাখি ফেলে দেখে নেয় আর কতটা...

যারা ফিরে গেল গাঢ়তার দিকে
ফিরে গেল আমলকী বধিরে
তারা এখনও উঁকি মারে,
চৌকাঠে ভাঁজ করে রাখে শান্ত চোখের পাতা।
আমার মেঘ লেখা পোকারা মুকুল এনেছো
এ কোন শীতকুয়াশায়!
পথিক এসেছো এ কোন শীতকুয়াশায়!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেই
মুখগুলো আর নাগাল পাচ্ছে না চুলের
এতে আমি কি প্রমাণ করতে চাই?
পুরোনো বাড়ির থেকে আলখাল্লা পড়ে
ফিরে আসছি কী আরও পুরোনোর স্ট্রিপে!
নাকি এ অব্দি এসেই, চোখ মেরে বলব
অন্ধকার মুছে গেছে, — এটা অন্য স্বপ্ন...

তবে কী হাজার বছর মিথ্যে!
এই যে শব্দ অবধি হেঁটে গেলাম আধখানা পৃথিবী নিয়ে
সেখানে সমুদ্র কই!
নুলো বলিরেখাতে স্টেথো রাখলেই
জলচৌকি পেতে বসে নুনো আবহাওয়া,
আসলে, হাজার বছর— তারও বয়স হয়েছে
অসুখ হয়ে ঝুলে আছে মৃত্যুর কাছাকাছি।

যেন কেউ, হাইফেনে ঠেলে ফেলে দিল আলো
ধুলো উড়ে গেল এক পায়ে, অজৈব কবিতার কারণে।
সব আলোই ঠিক ছিল— সব সমর্পণই।
তবু, কিছু ঠিক নেই, শুধু রেলিং ধরে
চুঁইয়ে নামে তারার ঘাম
আর, ভয়ে ভয়ে রোগা হয়ে যাই।
কানে আসে, ঝরে পড়ার সময় এসে গেল।

আমায় তবে জিজ্ঞেস কোরো, জলের ভিতরে জেগে ওঠা;
সমস্ত উড়ন সমস্ত বাতাসের সখ্যতা;
জিজ্ঞেস কোরো, স্বরচিত সিঁড়ির পাশে তোমার
কিছু হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি;
আসলে সবই শিকড়— এক একটা স্নায়ুর ভেতর
দু দুটো করে হাত উল্কিতে এঁকে দেয়
অশীতিপর বন্ধুতা।

বেওয়ারিশ জলের ওপর অস্ত যাচ্ছে
আলমেইনের পোড়া মাছেরা,
মুখ ধুয়ে ফিরে যাচ্ছে কমলালেবুর আলো,
নানান জাতের চোখ জ্বালিয়ে
টেনেটুনে ঠিক করে নিই শিরদাঁড়ার হেমন্ত বসন্ত,
পা দানিতে এখনও সেই পেরোবার বারণ
আলো ডাকলে আয়, রয়ে গেল ডুবে যাওয়া শব্দটা শুধু।

রোদ বাড়লেই সেই রংটার কথা ভাবি
রংটা ছুঁতে পারবে একদিন?
ছুঁতে পারবো রঙটাকে?
নদী আগলে আগলে রঙটাও একদিন নদী
এখন, মাঝ রাস্তার রোগা কালো শৈশব
মাটি সরিয়ে মানুষ সরিয়ে আমায় ডাকলে
আমি নিশ্চুপ... পাড় ছুঁয়ে আছি।

ফুল চেনাতে চেনাতে
মৌটুসি পাখিদের জ্বর এসে গেল।
জ্বর মানে কী?
আরেকটা আগুন পুঁতে দেওয়া শাশ্বত শিষে!
শাশ্বত মানে কী?
আগুনের কাছে আজ আর দাহ নেই
শুধু মৌটুসি জ্বর....

যতটা কাছে যাই হাত পৌঁছয় না তোমার শীতঘুমে,
ঘুম কি আসে নতুন জলের কাছে!
তোমাকে দেখিনা আর, প্রথম নৌকার গালে
সেই যে বসিয়ে গেলে জলচুরির গল্প,
বুকে এসে ঠেকলো নির্বাসিত কবির মৃতদেহ।
কিছুক্ষণ জেগে রইলো স্বেচ্ছামৃত্যু,
হারানোর গল্পেরা কিছুক্ষণ তা দিল ঘুমের ডিমে।

কথা রাখা কথাটা
খানিকটা কথার মতো।
নিজেকেই ঘিরে বেড়ে ওঠে এক বধির শূন্যতা।
অথচ জানে না কার কাছে যাবে।
কামিজ তুলে নেমে গেছে আমাদের তিতলি রোদ
শুধু ছায়া— ছায়ার মত মিথ হয়ে
পরবাসে কথা বেড়ে ওঠে।

আর সে মুহূর্তেই—
রক্তের ভেতর প্রার্থনা করে বসে সমস্ত মেরুণ
তাকে বলি, দরজাটা খোলা রেখে
বাদামবনে গেছে মৃত ফড়িঙেরা।
আমার চেয়ে পুরোনো আওয়াজগুলো
রুমাল নেড়ে যায় স্নায়ুর বীজে;
আর কারা কারা ছিল মনে নেই আজও
শুধু গাছকে প্রশ্ন করি,
কবে থেকে পচে আছি এমন নিঝুমে?

ভোরটা লাল হয়ে উঠছে,
এখন রক্তচাপ আমাকে ধরিয়ে দেবে নিঃশব্দ মৃত্যু।
গাছগুলো দাঁড়িয়ে দেখবে, তারপর
আদ্দির মতো ঝরে পড়ে ফিরে যাবে মৃত্যু সম্পর্কে।
এসব মুহূর্তে আমি অভিজাত।
রিংটোনে নেমে আসে জিরাফের মুখ
আর নিজেকে জিরাফ ভেবে শুধু কায়াহীন বেড়ে উঠি।

শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে হাওয়া
হাওয়া ধরে চড়ুইপাখি
কেউ জানতেই পারল না, বুকের ডানদিকে
কারফিউ রেখে গেল কফি রঙের ফিঙে মেঘ।
থেকে যাও বিজন, থেকে যাও।
নেশা ধরে ধরে তোমার বায়বী সুড়ঙ্গে—
এগিয়ে আসছি আমি।
আর কেউ কি কাঁদছে নক্ষত্রের দিকে যাবে বলে?

শব্দের ভেতর পা রাখছি।
ভেতরঘরের আটপৌরে শব্দগুলো মুড়ে মুড়ে রাখলেই স্বপ্ন।
খুলে দিলেই, আগুনের কাছে নেমে আসে
কটা রঙের কয়েকটা নীরবতা।
তোমার শহর জলজগন্ধ মাখে আবছা নদীর সাটিনে;
আর আমি, বিকশিত হয়ে
সুলেমানের প্রজ্ঞায় তুলে রাখি— শূন্যের প্রস্তাব।

এ জঙ্গল ওমনি ওমনি খোঁজে
আকল্পন তোমার পালানো— আমার ধরে ফেলা।
এ জঙ্গল ওমনি ওমনি খোঁজে
শোকে জ্বালানো তোমার আবহাওয়া।
জিজ্ঞেস কোরো, বাকিটুকু আকাশ
কিম্বা ঠিক ঠিক নীলকে, চুল বেঁধে দিলে
সেখানেও কি ঘুমে শান্ত... অনন্ত ঝাউপাতা!

ফুরোবার শব্দরা ক্রমাগত ঢুলে পড়ছে ঘুমে
আর একটা কড়া নাড়া, পাড় হয়ে যাচ্ছে
মাহরুম পাখির চুড়িতে;
আজ সংলাপে সমুদ্র নেই— নেই দীর্ঘ যুদ্ধ
ফিরে যাওয়ার জ্বর এতো মুখচোরা!
দীর্ঘ বিরতির মতো এক একটা অন্ধকার
চতুর্দশীর চাঁদে আঠা লাগিয়ে আনন্দে বুঁদ হয়ে আছে...

বারুদ গন্ধে মরে গেল শরাবী ঋতুরা,
বৃষ্টির জল পড়ে
সূর্য নরম হয়,
সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে ফুরসতটুকু
মীনে করে নেয় পোষা আল্পনা।
এই ধরো, আমরা আছি এভাবেই খাদ হয়ে—
কিছু নদী স্থির হয়ে
কিছু ছায়া স্থির হয়ে
বাকিটুকু ইস্তেহার দিয়ে গেছে
আরেক জঙ্গলে।

আজ ঘুমের মধ্যে
কেই বা চাইলে এ অনন্ত?
এ ফাল্গুনী বিলাপ!
ঘর পেরিয়ে, পথের বিশ্রামে
কোনো জানলা ছিল না সুজন আমার।
শুধু আলোর মতো রেখে গেলাম কিছু সকাল—
কিছু অক্ষয় সকাল— রেখে গেলাম বিদেহী জানলার পাশে।

এসব এক একদিন - সময় দেওয়াকে ভীষণ অপ্রয়োজনীয়
মনে হয়।
কেউ প্রশ্ন করলে, প্রশ্ন কুড়িয়ে ছুঁয়ে দিই চাপ চাপ
দুঃস্বপ্ন হয়ে।
বানিয়ে বানিয়ে বলি 'ভালো আছি'—
আসলে, ভালো থাকাটা পাতা হয়ে খসে পড়ে
জল থেকে জলে— ঘুম থেকে ঘুমে।
বুকের কাদায় আটকে গেলে জলের আদর,
সুইসাইড নোটে গুঁজে রাখি আদরের ঘুমপাখি।

যদি, রাতের বেলায় নেমে পড়ে ভেতরের শীত,
বলেছিলে গুছিয়ে রাখবে একমুঠি।
আজ-ঘিরে থাকা সব চাঁদে
দাগ দিয়ে দিয়ে মৃত্যু এসেছে পাশে।
তোমার পিনকোডে ফিরে আসা যুবকের ঘাম,
একটু বোসো, আর্দ্রতা পাতিয়ে
আসছি আজীবন।

টিপ পরাতে পরাতে লক্ষ্য করছিলাম
দু বছর আগের চোখ,— শালুকপাতার ভাপ মেখে
বাঁদিকের সাথে জুড়ে গেছে যেন।
ছুরি বার করে বলেছিল ঘুম হয়নি।
আমি নিশানা পুঁতেছি চোখের করিডোরে,
দু দুটো বছর ঝুঁকে দেখছি আতুকি ঘুমের আঙুল;
বন পেরোলেই,
এরপর সব মিথ্যে... শুধু, লাইটার জ্বেলে টুকে রাখছি
ঘুমের তারিখ

জ্বরটাকে ডিঙোলেই মাথা ভর্তি ভিজে চুপচুপ।
তোমার সাদা বাতাস ঠিক এখান থেকেই
দুবেলা দেখে নিচ্ছে আমায়
মেপে নিচ্ছে সূঁচ দিয়ে লেখা একটা ভাগ্য।
লাগোয়া বারান্দায় নামিয়ে এসেছি আমার দশটাকার জীবন,
মলাট দিয়ে নিও আকাশফুলের কাচ— মলাট দিয়ে নিও শীত শীত আলো
কিম্বা ভিজে যাচ্ছে যে মানুষদুটো...

শুধু ধোঁওয়া।
ঠিক কোথায় নিরাকারে ঠোকরাতে আসে খোলা জানলা?
আজ বোতাম খুলে আমার মুখের মত
কিছু একটা শুকোতে দিয়েছি বৃষ্টিতে।
কখনও খাইনি বৃষ্টি— ছুঁইনি আঁশের জল,
তবু যদি ভিজে যায় কুপির মেঘ,
এক যুগ থেকে দ্বীপ আগলাচ্ছে পাতাকুড়ানি মেয়ে।

এখনও উড়ছে, পোড়ো বাড়ি হয়ে,
দু কাঠা জমি হয়ে, বুকের শব্দের প্রতিটা পরমাণু;
জাঁকিয়ে ধরছে নৌকা খোঁজার অঙ্গীকার।
শুধু আল কেটে এগিয়ে গেছ মানচিত্রের দিকে, মেয়েলি জলের দিকে;
জল কোনো পরিমাপ নয়— অমোঘ শেকড়।
খোলা শরীরের কাছে চেয়ে বসে,
দরজাটা কই — দরজাটা কই!

দুলে উঠলো যা, যেতে হবে সে পর্যন্তই।
ওখানেই ধারণা শব্দহীন।
শুকিয়ে রাখছে শুঁড়িপথের সমস্ত ভেজা হাত।
আমার ইচ্ছে একটা গাছ বানাবার... খালিপায়ের একটা গাছ,
বিশ্রামের মতো অনেক পাখি ডাকলেই
মফস্বলের রাতেদের বলে যাবে
আকাশ খুলছে... আকাশ খুলছে...

আলো জ্বেলে, শীতের ভেতর দিয়ে
নেমে গেল গর্ভবতী ঝাউগাছেরা;
মন বোঝা গেল কিছু? কিম্বা কেয়াপাতার ভরকেন্দ্র?
হাতের নাগালে ন্যাংটো হাওয়ার ফিক
আর এতগুলো প্রশ্ন!!!... ছায়া-ছায়া-ছায়া
ঠিক যেন ছায়া নয়, বৃষ্টির মতো
বৃষ্টির দিকে উড়ে গেল তিতকুটে পোষা পোকাগুলো।

কি চাও? যৌনতা।
দেখো, কেমন বেঁচে থাকি— শুধু অনিমেষ সান্নিধ্যে।
আসলে জাগরণ মনে আছে,
সেই যে তোমায় ছুঁলাম ভোর বলে
তারপর তো কত মুহূর্ত— নির্মাণ বিনির্মাণ
তবু, সমান্তরালে আঁকতে পারলাম না—
সাদা রংএর আরও একটা বাড়ি।

ভাবছিলাম, ঝাঁকড়া গাছটার কথা।
ফুঁ দিলেই ফ্রক তুলে নেমে আসত
আমাদের অসুখের কাছাকাছি,
হাওয়ায় মেলে দেওয়া পীত গুঁজে নিত চোখের মাটিতে।
এ শহরে আজ পাতা নেই— তারারা চিনিয়ে দেয় না শ্যামাপোকার ঠিকানা।
গোটা চৌরাস্তায়, রোদ পোহানো শবনম
পাখির ঘামে তুলে রাখে প্রিয় মিথ্যে।

আমার একা লাগছে।
কি আশ্চর্য! সারা শহরের মাদী বসন্তেরা
রক্তের মতো কামড়ে ধরছে তলপেটের ময়নাকে।
কে কাকে ডাকলো? যেন হাত থেকে পড়ে গেল দুরুদুরু;
আকন্দ ফুলের কাছে নামিয়ে রেখেছি সিঁড়ির আলো,
আমি তাকে হাত ধরে নামাই সিঁড়ির কাছে,
আলোর কাছে,
আর আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে চললো একটা শালিক

শহরের রাস্তায় এখন আর কোন চিহ্ন নেই।
শুধু হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকা নিম্নচাপের কুচি।
কিছু দূর যাবার পর-ই ফিকে কোলাহল
কিছু দূর যাবার পর-ই থুরথুরে চাঁদের পালিশ,
পা চালিয়ে ফিরে যাচ্ছে চিরটাকাল।
আর, কিছু দূর যাবার পর-ই, তোমার বিশ্বাস
জোনাকি রঙের ফ্রক পড়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে মৃত্যুর শিরিষ।

উঠোন অবধি সারাটাদিন।
দাগ টেনে টেনে দাঁড়াই সারাটা দিনের পাশে।
এখন চোখ বেঁধে বলে দিতে পারি থ্যাঁতা রোদের নোঙর,
ঠিক ওখানেই কাঁচের গুলির মতো পরে ছিল প্রজাপতির ভ্রূ।
না-না প্রজাপতি নয়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
পুড়ে যাওয়া রক্তের চোখ।
তুমিও কি বোঝো? বেলা পড়ে এলে উঠোন ঠিক কতখানি!

এখন মাটির কাজ শেষ।
পিদিম জ্বেলে শরীরের সবটুকু ঘুরে আসা যায় অনায়াসেই,
রোববারের আবহাওয়ার অর্ধেক দেওয়া ছিল তোমায়,
তুমি তুলে রেখে গেছ অনেক লেখার দেওয়ালে।
এখন দেওয়াল লেখা শেষ।
আল ধরে ধরে ছেড়ে যাওয়া হাতের কাছে আসি
সবটুকু ঘুরে আসা যায় যদি...

শরীরের কাছে নগ্ন হলেই চোখ ফিরিয়ে নিই।
খালি চাপ চাপ বলিরেখা— মেঠো ইঁদুরের সাথে
ফিরে গেছে যৌথতার নোঙরে;
কারা যেন সহজেই খুলে ফেলেছে নিশ্চুপ শাসন,
আর আমি, সবুজ পাতা দিয়ে পাহারা দিয়ে চলেছি
প্রত্নকুশের দ্বিধা।
আসলে খোঁজা বিষয়টা বড়ই নিঃসঙ্গ।
অবঞ্চনা হলেই কাঁকড়ের মত চ্যাপ্টা-
যেন চোখেই পড়ে না।

তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে আমার রক্ত
আমার গুঁড়ো গুঁড়ো একশো আট পাখি হওয়ার লোভ।
ভাবো, শুধু বুকে টেনে নিয়ে হালকা হওয়ার কথা;
যেসব টিপের কাছে ফেলে এসেছিলাম মৌসুমি চিঠি
তারাই আমাকে জ্বালিয়েছে যেন শুকনো আগুনে
আমিও কি বেঁচে আছি?
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি
হাঁটু পর্যন্ত গোটানো জ্বর।

জানি, একশো একটা উপায়ে
জাগিয়ে রাখছো মাথা।
মরদ ঘোষণাগুলো এতো ভারী,— গভীর অসুখের দিকে
তাক করলেই, বদলে যাচ্ছো কি অনায়াসে;
কিন্তু কে জানে, শাড়ি পড়া কোকিলটা
রেলিংএ এসে দাঁড়ালেই, আজও কেন
অসমাপ্তকে ভোর বলে ডাকো।

কিছু চলে যাওয়া আসলে বয়ে যাওয়া
ধান ঝাড়তে ঝাড়তে চুল বাঁধতে বাঁধতে
এক একটা পাখি ঠোঁট সেঁকে দিল শীতরঙে;
তারপর বহুবার, লঙ্কাজবা গাছটার কাছে এলেই টের পাই
তার রুপোর মল, কুলুকুলু জলের মত
আরও এক কায়াহীন মিথুনের শরীর;
গাছ-পাতার অন্তর্বাসে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামে
শুয়ে আছে আরও এক বোঝাপড়া।

গড়িয়াহাটার মোড় থেকেই আমাকে তাড়া করেছে
জ্বরে পুড়ে যাওয়া রুগ্ন প্রতিশ্রুতি।
সে কি মৃত্যু? নাকি পাতাকুড়োনো মেঘের নিচে
আর কেউ নেই।
এখন অন্য দেশে।
গড়িয়াহাটের পাখিরা আর কবির কাছে আসে না
তারা চোখ হয়ে বসে। সাদা থানে নিভিয়ে রাখে
নিঃস্ব প্রতিরোধ
কবি কি জানে! পোঁতা গাছগুলো-পোতা পাখিগুলো-
দুমানুষ বধিরে মলিন-মলিন...

কুয়াশার মতো শ্বাসকষ্ট ছেড়ে রেখেছো পরিযায়ী পরবাসে।
শুধু শিকড় নামিয়ে দেখি, মাটি তার কত দূর
কত দূর দুচোখের জ্বর।
পাশ ফিরে শুলে, উঠে বসে দন্ডকারণ্যের রোঁয়ানো চাঁদের যোনি।
কি পুঁতলাম? একা একা বুড়ো হয়ে যাওয়া!
এবার নিঃশ্বাস নেব— বড় করে বলে উঠব আসি
চৌকাঠ পেরোলেই, গর্ভযন্ত্রণায় রেখে যাব জারজ শীতকাল।

বাতিল হরিণের দিকে ছুটে চলেছে শেষ প্রজাতি
আর দু হাতে মুঠো করে রেখেছি আমার বেড়ে ওঠা।
আমি কি কেটে ফেলতে চাই ঘিঞ্জি যোগফল?
একবার দেখলাম আমি কাঁদছি; একবার ঠোঁটের রঙ
মিলিয়ে মিলিয়ে গাছের কাছে চেয়ে নিচ্ছি বিমুখ অরণ্য।
ঝিমুনির পাশে টহল দিচ্ছে অপরাহ্নের দোষ
এই আমি, গবেষণা করছি কলোনীর প্রকৃতি...

শটিবন পেরোতেই আহ্লাদী ডাঁটা থেকে নুয়ে পড়ে কুয়াশা
যেন অর্ধেকে জোড়া রোগা পৃথিবী
ফুরোতে চাইছে পৃথিবীরই এক কোনে।
আর আমরা তিনজন, এইমাত্র চেকারের
হাতে তুলে দিয়েছি হাইতোলা শৈশব।
অরফিউস, তুমি কি জানো— কোথায় রাখা ডানবুকের গুচ্ছলেখা চিঠি?
কোথায় রাখা,
হিন্দুমতে লাল ফড়িংএর সাথে অনন্ত বাসরবাস!

একটা অল্পবয়েসী ছেলে টেনে নিয়ে গেল
সেই রাতটার কাছাকাছি
যে রাতের নাম রাখা হয়েছে ঘৃণা।
ঘৃণার মজুরি কতো?
বুকের বাকল খুলে সাদা সাদা পাতায় দেখি
রাতের অনেক নাম
যা দেখা যাবে না আর একটু পরেই।

কোনোদিনই বুঝবে না বিকেলের বিপন্নতা
স্কুল করে ফিরছে যে আলো, সে জানে
খোঁটায় বাঁধা অপরাজিতা ছায়ার মুখ;
ধুলোমাখা প্রান্তর চিবিয়ে চিবিয়ে
পাখিওড়া বুজে নেয় জিরাফের বিস্তারে;
এরও পর আলো,— ফুসফুস ভর্তি আলো ভাঙার শব্দে
কিছু বাজে লোক ফসফরাস ছুঁড়ে দিল প্রবাসী লতিতে।

কাঞ্চনের ঝোপে খুব অস্পষ্ট একটা পাতা পোড়ার গন্ধ।
জানতাম না, পাতাদের কোন দোসর নেই।
মুখাগ্নি করতে এসে খড় গুঁজে দেয় যে আগুন,
তাও আসলে জোড়াতালি ধোঁওয়ার অর্কেস্ট্রা।
এরপর, গল্প চলতে থাকে, আবহমানতায় দাঁড়িয়ে
সেসব মানুষ
মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো পাতা জ্বালিয়ে
কোলাজে বসিয়ে নেয় সব পুড়ে যাওয়ার গল্প।

হঠাৎ একটা ছবি মনে পড়ল
আঁকতে আঁকতে কারা যেন উঠে গেছে কুহু ডাকে।
আর, সেই পাখিরা— নগ্ন মেঘেরা— দাঁড়িয়ে আছে একঠায়
বেসামাল বিটপের ঠোঁটে।
মাঝে মাঝে ভুলে যাই পৃথিবীর জ্যামিতি
মাঝে মাঝে ভুলে যাই ফিরে আসা।
লবঙ্গীর বনে নড়ে ওঠে আরও একটা পোড়ানো নিলয়।

আবহাওয়া এখন কিশোর
তিনবারে ডাকলে মুখ ভার করে
চুল আঁচড়ে দেয় মনি-পাখিদের,
এখন রক্তের ভেতর শালিখ, রক্তের ভেতর চড়ুই।
বিউগলে ঠোঁট খুলছে ক্রিয়াহীন অধিকার,
এক একটা মাটি লক্ষ্য রাখছে,
শার্ট খুলে পাতাদের চাঁদ হয়ে যাওয়া।

বাঁধা চাকরির মানুষটা, যার নাম বাবা,
রোজ দেখতাম কচি কচি রোদগুলোকে প্যান্টের জিপার টেনে
পাড় করিয়ে দিচ্ছে ঘুমন্ত পৃথিবী।
এভাবেই বেড়ে ওঠে জলের ছেলেমানুষী— বেড়ে ওঠে ছায়ার ইক্যুয়েশন।
কেউ জানতো না ফুলগুলো ছাড়া গাছেদের রক্তশূন্যতার কথা।
এখন অসহায়ভাবে উসকো রোদের ভেতর বসে পড়লেই
বাঁধা চাকরির মানুষটাকে মনে পড়ে— কিম্বা, একরতি হাওয়া...

দু চারটে কথার পরই এক একটা বিরাট ছায়া
জিপ থেকে নেমে এসে ফুটে ওঠে
স্মৃতিহীন পাহাড়ের দিকে;
একলা মেয়ের হাতে গা ধুয়েছে পাহাড়
শুধু তার আদি কথা, গোটানো বিকেল নিয়ে
ফিরে গেছে মেঘান্তরী বন্দিশে;
মাঝে মাঝে মনে পড়ে
আমাদেরও হাত ধরা ছিল আধফোটা জনান্তিকে।

চিঠি গলা রোদের কাছে
আমার কোন সাজগোজ নেই।
কিছু শব্দ পেরিয়ে এলে
কিছু পাহাড় পেরিয়ে এলে
তোমার হলুদ বাটা চুমু পেরিয়ে পেরিয়ে
আমার শর্মিপাখিদের শুধু ছোঁওয়ার ইচ্ছে হয়।
ইচ্ছে হয় সে সব নির্মোক— যা আছে বলে জানতাম।

এইসব লঘু ভোরে বুঝতে পারি
কবিতাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে
ফিরে গেছে রোদজানলায়।
আর আর্তনাদগুলো
মানুষের মতো কিছু ব্যবধানে।
রাত্রি খুলে দিলে, গুনে গুনে বলে দিতে পারি
তাদের প্রত্যেকের মুখ— প্রত্যেকের মাথা।

গোটা সম্পর্কে উপুড় করা
তিনভাগ জল।
তবু, কিসের খাতিরে বেঁচে আছি
তোমার গোলার্ধে?
হাওয়ার দিকে জানলা খুলে দেয় মর্জিরা— খেয়ে ফেলে নদী
আর, নিয়ম মেনেই দিনরাতগুলো
সুখ ভেবে ছুঁড়ে মারি হাহা স্থলতায়।

একটা দুটো আনমনা
এভাবেই কোথায় চলে যায়।
বৃষ্টি হয়না, অথচ
আমার মানুষজন্মে রেখে যায় মেঘের আঁচড়।
এখন বিশ্রামের ভেতর ফুরসতের কোমা
দেখিয়ে দেয় সঙ্গহীন ডানার তোরঙ্গ
দেখিয়ে দেয় অলিন্দ পাখির ঘর।

জানো, কোন গান গাইছে ওরা?
আসলে ফিকির— নতুন করে আগুন টাঙ্গাবার,
জলের ধারে ধারে দূরভাষ নাকছাবি
কিছু ঘোর খোঁজে, আলো জ্বেলে
দেখে নেয় জলের ছায়া।
দেখে নেয় নিরলস মিথ্যে, রুমেলা পতঙ্গ হয়ে
ফুঁ দিচ্ছে আত্মজ আগুনে...

যদি না ঘুমোতাম! ঘুমের চোখ ডলে দিতাম
অশনায়া ডাকবাক্সের গায়ে!
সব কথা চলে যেত হাঁটতে হাঁটতে— মনখারাপের মতো
কাঁচা চোখে লিখে নিত, কেউ নেই— কেউ নেই;
রাত থাকতেই গন্ধ মনে পড়ে মধ্যরাতের,
গাছের পেছনে— মেঘের পেছনে
যেন আমি হয়ে যাই অন্য পুরুষ।

তাকে ডাকলে, অপরাধী মেঘ নেমে আসে
বৃষ্টি চুরির দায়ে।
কে বলেছে পুরোনো গল্প সব?
এখনো উড়ুক্কু মাছের মতো নদী পেরোতে পারি
ভীষণ বৃষ্টি হলে।
ভীষণ বৃষ্টি হলে, দু মিনিটের বাতিঘরে ফিরে যায় মণিপুরী আলো
আর হাজারটা মেঘ নিয়ে বুনে চলি শব্দহীন রানওয়ে

দোতলার ঘর জানে সব
তবু, স্বীকার করবে না জলের কথা।
বৃষ্টি হোলোনা, শুধু, বিকেলের মত ভেসে গেল যারা
তাদের খুঁজছি, গাছ পেরিয়ে পেরিয়ে গাছের আশ্রয়ে।
ছাদের ওড়নারা কুড়িয়ে পেয়েছে পাতা-পাতা-
ফিকে মাখানো পাতার দূরত্ব।
কুড়িয়ে পেয়েছে মলাটে লেখা প্রথম নৌকাডুবি।

কিছুটা দুপুর রাস্তা পেরোলে
দু চোখে বেলা পড়ে যায়। ভয় করে।
ভালো আছো?— শমী গাছ!
ভালো আছো? — সজল!
অদূরে দাঁড়িয়ে, তোমার আসমান
শিস দিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দেয়
কলি পেরিয়ে আমার পিউপাদের পাখি হওয়ার প্রস্তাব।

বালিশের মেঘে ভিজে গেছে টিয়া টিয়া কান্নারা।
তাদের ছোট ছোট ভ্রূণেরা
কুলুপ এঁটে, শুধু জেগে আছে চুল খোলা জানলায়।
জানলা খুলতেই ভীষণ মনে পড়ে
সেসব মাটি হয়ে যাওয়া যাপন। যারা উড়ে গেল
কালো তারায়— আলো তারায়;
সে মুহূর্তেই কি
চোখের জলকে শেখালে জোনাকি ধরার ছলছল...?

একটা আকাশ।
পাশ ফিরে শোওয়া আরেকটা আকাশ।
আমি তো জানি, এভাবেই নীল চিবিয়ে চিবিয়ে
ঝিল পেরোবে গ্রহণের রাতেরা।
আমার ইনসমনিয়া, ঘুম চিনেছিলো ঝিম জানলায়।
এই যে, পিছু পিছু, তৃতীয় দৃশ্যে নেমে গেল
বিষণ্ণতর শহরেরা,
একা ফুল, একা ফুল— একা হতে চেয়ে
আঁকড়ে ধরল ভোরের মৃত্যু।

বর্ষাকাল এলে— মেনে নেওয়ার গল্প লিখি
হতে হতে বৃষ্টি মুড়োয় না হওয়া। নাকি হওয়া?
বাঁ পকেটে রাখা আমার মেনে নেওয়ারা
বিকেল বসিয়েছে দুধিয়া অনুস্বারে;
মেঘের দিকে উঠে গেছে
সেসব ঘুন কেয়াপাতা
ফুরিয়ে যাওয়ার ভেতর শুধু বেঁচে আছে
আনপড় নীরবতা।

নামতায় লেখা নিষিদ্ধ করিডোরে
তোমারই আলোচনা।
এখন বিকেল— পাঁজাকোলা করে কারা দিয়ে গেছে
দু চারটে আইবুড়ো রোদ।
এসো, গেছো বাউলের কাছে এসো—
দেখো, অশ্লীল হতে চেয়ে কিভাবে যেন টিপ করছে
তোমার-ই হেমন্তের চোখ;

প্রতিটি চোখের ভেতর নেমে আসা
শানে বাঁধা ঘাট, চুমুর খবর জানে
নখ খুঁটলেই গোলা ভরে যায় আমার স্নানের
নিশ্চুপ স্নানের...।
পোষমানা নদী, তুমিও কি জানো
ঝিনুকের মুখে বিক্রি আছে বিস্ময়।
তখনো ফোটেনি— তবু, পাশ ফিরে শুলে
প্রজাপতি হয়ে যেতে পারে।

পোস্টকার্ডে পাঠিয়ে দিয়েছি আগামী বাইশ বছর।
কিভাবে ঘুমোতে পারব না আর কয়েকডিগ্রি নেমে গেলে,
শার্ট খুলে ফুসফুসের কোয়ায় কিভাবে ভরে নেব বিচ্ছিন্ন আলোকবর্ষ
সবকিছুই পাঠিয়ে দিয়েছি সাদা সাদা পাতার নীল নীল ঠোঁটে।
তুমি ছুঁয়ে দিও দুপাট বুকের শীত কিম্বা
একটানা জলে ভেজা নির্বাসনের রাত,
এরপর, কবিতা লিখে দেব— একটা দুটো অনন্ত অন্বেষণে

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি কি বেঁচে আছি?
ঘুমের ভেতর লেপ্টে থাকা ঘুঘুকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখি
ফুরিয়ে এলো ঘুম, ফুরিয়ে এলো পরকীয়া দিন আর রাত;
মাঝে মাঝে বাঁচবো বলে কম্পাসের কাছে আসি
লম্বা লম্বা রাস্তার দিকে জানলা খুলে
এঁকে ফেলি অকালবৃদ্ধ গাছেদের শহর। এখন আর
সকালকে দেখিনা— শুধু, গাছেরা আমাকে নিয়ে যায় বিশাল
ছাদের দিকে...

সেই দূর, ঠোঁটে নিয়ে ফিরে গেলে পালতোলা ঘুমের আলোয়।
আর আমি, জ্বেলে দিলাম নির্নিমেষ আঁধার।
ফিকে জানলায়, মরা পাখিরা তখনও ফুলের জন্য
উড়ে উড়ে জুড়ে জুড়ে মেপে নেয় নির্বিকার দৌড়ের বাতিটুকু।
এ নিকটতা, আজ শব্দ নয়, শুধুই ঘুমের আয়োজন।
আর কিই বা আছে রেখে যাওয়া ছাড়া?
সব ভালো হয়ে যাওয়া জানলায়
কারা যেন রেখে গেল শীত বানাবার গল্প

পাড় বাঁধানো শিরাগুলোয় নামিয়ে রাখবো প্রফুল্ল মিথ্যে।
এমন-ই কথা ছিল;
ধরো আমি নেই।
কাঠের জ্বালে, তুমিও বদলে গেছ রাতের সেলাই রেখে।
স্বপ্নদোষে এখন যে কুয়াশারা মার্জিনে রেখেছে দাঁড়ের শব্দ
ঋতু জানে, তুমি সেখানেই।
ডানদিকের রাস্তাটা পেরিয়ে গেলেই
পৃথিবীর সমস্ত মনখারাপ নিয়ে পুড়ে যাবে একটাই দেহ...

কি খুঁজছি?
বৃষ্টি নামের মেয়েটিকে?
শরীর থেকে খসে পড়লে নদীর গল্প
আমার সর্বনাশের কাছে কেউ থাকে না,
বকুল-বকুল-পড়শী নিখোঁজ।
সেমিজ উঠিয়ে ফিরে গেলে বেনামী ভোর,
আমার আঙুল ছোঁওনি
তবু, ঘেমে উঠছি খুব...

জানো, কাল আরও একটা পাখি উড়ে গেল
পালকে গেঁথে গেল বাদামী শ্বাসের ঠোঁট;
ইশতেহারে টাঙানো আমার একটানা জ্বর
বাড়ি ছুঁয়ে বুড়ি ছুঁয়ে, কোমরে বেঁধেছে বৌনির পলি,
যেন এই ভাঙ্গাতেই বেঁচে থাকা।
এখন জোড়া ভুরু ঘুমিয়ে কাদা
একা সিঁড়ি- সিঁড়ি- জানে শুধু উড়ে যাওয়া।

ধরা দেবে না কেউ।
আমরা নদী পেরোবো
অভ্যেস করে নেব নদীর নাম অবধি।
তবু, ঢেউয়ের ফোঁড়গুলো একটানে খুলে ফেললেই
ঢেউয়ের দিকে উড়ে যাবে রোদরং-এর মুনিয়া, আত্মজ হরিয়ালি...
হয়ত ভুলে, জলের দিকে এগিয়ে যাওয়া
তবু, বাকি আছে অজস্র ফেনার শরীর।
স্নান নিতে আসা আমার ক্লীবতা...

তোমার শব্দে এ কোন ঈশ্বর?
সমাধিতে মেলে দিলে পোকায় কাটা আদর
রোজ ফোটে ক্ষয়ের সংসার।
কিছুটা জেনেছি, কিছুটা নৌকা এঁকে ভাসিয়েছি মরা চোখে।
হাঁটু মুড়ে ফুটে উঠি;কতকাল পরে এমন ফুটে ওঠা!
আজ বন্ধক পংক্তিদের ছেড়ে যেতে চাই
তোমার-ই আবহাওয়ায়।

করিডোরে দুচোখ ফেলে তলিয়ে গেলেন যিনি,
ডালপালা সরিয়ে দেখি ঠিক আমার-ই মতো
চুল ধুচ্ছেন শ্রাবণের ঝিরে।
দেখাশুনো হলো, হলো অনেক কথা গোধূলিতে দাঁড়িয়ে;
আরও দূরে, হাঁটু মুড়ে থিতানো আকাশ
আ-কার ই-কার সরিয়ে রেখে গেলে ঘুমের ধুনি
পিচুটি পেরিয়ে জিজ্ঞেস করি— কে আমি?

চুমু খাওয়ার পর কেন শেখালে
মুছে ফেলার অঙ্গীকার?
আমার ষোলকলায়, তোমার চোখের পাতা নামতেই
ঝিল পার হলো বৃষ্টিগাছ।
দেখো, পালকের রং কেমন সেঁকছে আগুন,
আগুনের পাখি যুদ্ধে যাবে বলে
গোপন ক্ষতে তুলে রাখছে রাতের চিহ্ন।

দূরে যাও। এসময় আমি ঘুম চাই না।
সাদা থান পড়া কাঠচাঁপার গায়ে এ সময়
বিছিয়ে নিতে চাই আমার মগজ— আমার শ্বাসকষ্টের আলাপ
কি করে শুনবে গাছ?
সে কি আলো জ্বালাতে জানে সর্বস্ব বাজি ধরে?
এতো রাত্তিরে আমি ঘুমোতে চাই না
টর্চ জ্বেলে জ্বেলে বিচ্ছেদে কুড়িয়ে নিতে চাই স্বভাবঘুমের মুকুলগুলো।

খুশি রাখার জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় একটা রাস্তা খুঁড়েছি
পকেট থেকে নামিয়ে রেখেছি মেঘ,
ভেজা ভেজা মেয়ে জোনাকির পা।
ঘুমন্ত শহরের দিকে কাকে যেন বলেছি— প্লীজ, আমাকে
খুশি থাকতে দিন।
খুশি কি বস্তু? কাঠ হয়ে যেতে যেতে
নোটখাতায় লিখে রাখি আমারই আত্মহত্যার নির্দেশ।

কতগুলো প্রশ্ন ছিল,
বয়ঃসন্ধির টোলে যারা উড়িয়ে দিল চুলখোলা প্রজাপতির চোখ
তারা এখন কোথায় আছে?
তারা কি ছাতা ধরেছে ঘুমধরা খোয়াইয়ের মাথায়?
এখন সাদা কালো দেখি তোমার পুরোনো সেমিজ।
স্কুলগেটে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা কালো রোদ জ্বর শুকিয়ে নিচ্ছে এই শীতেও,
হয়ত শেষবেলার বিকেলে তুমিও নিভিয়ে দিচ্ছো কমনরুমের পাখি

দুদিন পরেই হাজির একটা মানুষ। চুমকিবসানো।
বন্দরের দিকে জন্মাতে দেখেছি তাকে অনেক আগেই
শুধু, হাত টের পায়নি প্রতিটি হাতের ফিরে যাওয়া
মুখে মুখে পড়ে যাওয়া সূর্যাস্ত।
পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মুখ ফিরিয়ে নেয়
দু একটা রক্তিম-দু একটা বিষাদ,
এখন, আবহাওয়া বলতে পাখিদের খুলে রাখা চোখ।

কোথাও কিছু নেই
তবু অর্ধেক জীবন ধরেই একা একা হাঁটছিলাম
ওই সুন্দর রাস্তাটা ধরে।
কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখছিলাম সমর্পণের উলু
বনচিতির গালফোলা অভিমানে।
সবই পরিযায়ী...

শুধু মাঝে মাঝে একটা আমি
ককপিটে বসে দেখি,

একা একা হাঁটছি ওই সুন্দর রাস্তাটা ধরে।